



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 122 - 129

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অপরাধ জগতে নারী : বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দার গোয়েন্দাগিরি

লোকেশ্বর রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: roylokes23@gmail.com



Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Mohila Goyenda,
Krishna and
Agnisikha Roy,
Gondalu, Damayanti
dattagupta, Gargi,
Pragynaparamita
Mukherjee, Haimonti
Ghoshal and
Boishakhi Banerjee,
Dipshikha
Mukherjee.

Abstract

Once upon a time Bengali detective literature was a world dominated by male characters. In this world, the idea of a female detective was a strange fantasy that was considered as impossible as a 'golden stone bowl'. In the eyes of literary critics, detective literature itself was second-class and female characters were even more neglected. But with the change of time, this idea broke down and a new horizon opened up in literature that opened the way for women's empowerment and self-reliance. This journey began with the character of Krishna, created by the influential goddess Saraswati, who broke the barriers of traditional society and opened up a new horizon of women's freedom. Then, the emergence of teenage detectives in Nalini Das's 'Gandalu' series proved that it is not age or gender but intelligence and courage that are important for solving mysteries. Manoj Sen's character of Damayanti Duttagupta gave birth to a new trend where analytical intelligence became more important than professionalism. However, the fulfillment of this journey came in the modern era when the characters of Tapan Banerjee's Gargi and Suchitra Bhattacharya's Mitin Masi arrived. Gargi has established a perfect balance between her family life and detective work, showing that a woman can be a successful professional detective and a skilled housewife at the same time. On the other hand, Mitin Masi started a new chapter in Bengali literature as the first fully professional female detective. She took her profession not just as a hobby but as a livelihood and said- People work for their stomachs, I do detective work. These female detectives have not only solved the mystery of crime but have also broken the old customs of society and opened new paths for women. Their popularity is now not limited to the pages of books but their presence is also increasing in films and web series. This proves that the path of women in Bengali detective literature is now a new, strong and well-established chapter. In the modern era, these female detectives have gained further perfection.

Discussion

গোয়েন্দা, তায় আবার সাহিত্য শুধু তাই নয়-নারী। এই ধারণাটা অনেকের কাছেই অসম্ভব মনে হতে পারে, যেন ‘সোনার পাথর বাটি’। গোয়েন্দা বা অপরাধ বিষয়ক রচনাকে ‘সাহিত্য’ বলা যায় কিনা, তা নিয়েই দীর্ঘকাল ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। গোটা পৃথিবী জুড়ে গোয়েন্দা সাহিত্য একটি অতি জনপ্রিয় সাহিত্য ধারা হলেও সাহিত্য সমালোচকদের চোখে এটি এখনও দ্বিতীয় শ্রেণির সাহিত্য। তাইতো তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –

“কিন্তু অকপটে বলি, গোয়েন্দা উপন্যাস লিখলে তাঁরা হয়ে যান দ্বিতীয় শ্রেণির লেখক।”^২

একই সুরে হীরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন –

“ধরনটা এই রকম যে এই ধরনের গল্পকে আর যাই বলা যাক, সাহিত্য বলা যায় না।”^৩

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনির আগমন ঘটে এবং একুশ শতকেও এর প্রতি লেখক ও পাঠকের আগ্রহ অটুট রয়েছে। সমালোচকদের বিচারে গোয়েন্দা সাহিত্য যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, জনপ্রিয়তার দিক থেকে এটি আজও অদ্বিতীয়। পূজাবার্ষিকী সংখ্যাগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু প্রাচীনতা নয়, সংখ্যাগত দিক থেকেও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের কাছে এই ধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সেই জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ। এই কারণে একের পর এক গোয়েন্দা কাহিনি রচিত হতে থাকে এবং এর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এই ধারায় কোনো ভাঁটা পড়েনি। তবে গোয়েন্দা কাহিনির কথা উঠলে পাঠকের মনে সাধারণত একজন শক্তিশালী পুরুষ চরিত্রের ছবি ভেসে ওঠে। মহিলা গোয়েন্দা এখনও পর্যন্ত ঠিক গোয়েন্দার পদমর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি। গোয়েন্দা সাহিত্য মূলত একটি পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্যধারা। কেননা তৎকালীন সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী অপরাধ জগতে নারীর স্বাধীনভাবে আনাগোনা বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত নারীরা শিক্ষিত হলেও তাদের জীবন ছিল মূলত সংসারকেন্দ্রিক, তাই গোয়েন্দা সাহিত্যে তাদের উপস্থিতি ছিল খুবই সীমিত।

সাহিত্যের জগতে গোয়েন্দা কাহিনি যতটা তচ্ছিল্যের বিষয়, গোয়েন্দা সাহিত্যের জগতে মহিলা গোয়েন্দা তার চেয়েও বেশি উপেক্ষার পাত্রী। একজন পুরুষ গোয়েন্দা নানা ধরনের হতে পারে, যেমন কাকাবাবুর মতো হুইলচেয়ারে বসা মানুষ বা দীপকাকুর মতো ভুলো মনের মধ্যবিত্তও গোয়েন্দা হতে পারেন। কিন্তু নারী গোয়েন্দার কথা শুনলে শুধুমাত্র সমালোচক নয়, লেখক ও পাঠকের মনেও এক ধরনের তচ্ছিল্য জেগে ওঠে। এই প্রবণতা কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় পাশ্চাত্য সাহিত্যেও দেখা যায়। অর্থাৎ সাহিত্যের দরবারে গোয়েন্দা সাহিত্য যেমন দ্বিতীয় শ্রেণির তেমনি গোয়েন্দা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীরাও যেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সময় বদলেছে, আর সেই সঙ্গে বদলেছে মানুষের মানসিকতাও। তাই বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে নারী গোয়েন্দার আগমন। শুধু নারী লেখিকাই নন, অনেক পুরুষ লেখকও সফল নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। গোয়েন্দা কাহিনির লেখকরা সব সময় নারী গোয়েন্দা চরিত্রকে তচ্ছিল্য করে গেছেন, তা নয়। বরং বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক পুরুষ লেখক আছেন যারা নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন – সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) ‘বিন্দিপিসির গোয়েন্দাগিরি’ অথবা প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-১৯৯০) ‘ঠাকুমা গোয়েন্দাগিরি’। বিন্দিপিসি ও ঠাকুমা একেবারেই আদ্যন্ত্য বাঙালি। শুধুমাত্র বুদ্ধি খাটিয়েই তারা রহস্যের সমাধান করে দিতে পারে। তবে বিন্দিপিসি ও ঠাকুমা দুজনেই মিস মারপেলকে অনুসরণ করে নির্মিত দুটি কাহিনি। বিশ্ব সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থেকেই বাঙালি লেখকরা আগাথা ক্রিস্টার (১৮৯০-১৯৭৬) মিস মারপেলের মতো চরিত্রটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় এমন চরিত্রও নির্মাণ করেছেন। নির্মাল্য কুমার ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বলেন –

“বাংলায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ নামক প্রাণীটির জন্ম যেমন সম্ভব হয়েছে শার্লক হোমসের কৃপায়, একই ভাবে বলা চলে বাঙালি মেয়ে-গোয়েন্দার আবির্ভাবের পিছনেও রয়েছে আগাথা ক্রিস্টি ও মিস মারপেলের তাগাদ।”^৪

ড. পিনাকী দেব মতে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় গোয়েন্দা সাহিত্য স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে গড়ে ওঠেনি। প্রাচীনতার দিক থেকে দেখলে ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের পর বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য তৃতীয় স্থান দখল করে আছে। শুরুতে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে এই ধারা বিকশিত হলেও পরবর্তীতে তা নিজস্ব এক গতিপথ তৈরি করে

নেয়। অধিকাংশ সমালোচকের মতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৫-১৯৪৭) হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনির সূচনা হয়। গোয়েন্দা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নারীদের আগমন খুব বেশি দেরি হয়নি। গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ‘বিভাব’ পত্রিকায় ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার প্রাপক হিসেবে তিন জন লেখকের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ‘কোরক’ সাহিত্য পত্রিকার গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যায় পিনাকী ভাদুড়ী তাঁর ‘বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি: একটি যথাসাধ্য খতিয়ান’ প্রবন্ধে জানাচ্ছেন যে, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে গোয়েন্দা কাহিনির জন্য চারজন লেখক পুরস্কার ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার পান।

“শ্রীহট্ট স্কুলের হেডমাস্টার রজনীকান্ত দত্ত, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শান্তিনিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায়, অমৃতবাজার পত্রিকার সরলাবালা সরকার গোয়েন্দা গল্প লিখে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।”^৪

‘কুন্তলীন’ পুরস্কার পাওয়া চারজন লেখকের মধ্যে সরলাবালা সরকারের (১৮৭৫-১৯৬১) নাম পাওয়া গিয়েছে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। তিনি তার ‘ঘড়ি চুরি’ কাহিনির জন্য নবম পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয় যে, সরলাবালা রহস্য উন্মোচনকারী হিসেবে ‘সুধাংশুশেখর বসু’ নামে একজন পুরুষ চরিত্র নির্মাণ করেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে মহিলা লেখিকার হাতে সৃষ্ট হওয়া প্রথম নারী গোয়েন্দা চরিত্রকে নির্মাণ করে তার গোয়েন্দাগিরির কাহিনি পাঠকের সামনে প্রথম তুলে ধরেন যিনি, তিনি হলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৯০৫-১৯৭২)। তিনি শুধু একটি নতুন চরিত্রই তৈরি করেননি বরং তৎকালীন সমাজে প্রচলিত –

“মেয়েদের বুদ্ধিহীনতার অনড় মিথকে ভেঙে গুড়িয়ে এক গোয়েন্দানীর ধারাবাহিক কারবার নিয়ে যিনি বহুদিন আসর মাত করে রেখেছিলেন, তিনি প্রভাবতী দেবী সরস্বতী।”^৫

তাঁর কৃষ্ণা চরিত্রটি শুধুমাত্র একটি গোয়েন্দা চরিত্র ছিল না বরং তা ছিল বাঙালি সমাজে নারী স্বাধীনতার এক প্রতীক। তৎকালীন সময়ে যেখানে নারীদের জীবন মূলত সংসার কেন্দ্রিক সেখানে কৃষ্ণার মতো একজন সাহসী, বুদ্ধিমতী এবং স্বাধীনচেতা নারীর অপরাধ জগতের মোকাবিলা করার চিত্র নিঃসন্দেহে প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। প্রভাবতী দেবী শুধুমাত্র ভারতের প্রথম মহিলা গোয়েন্দা সিরিজের স্রষ্টাই ছিলেন না, তিনি গোয়েন্দা সাহিত্যে নারী চরিত্রের সম্ভাবনা উন্মোচন করে পরবর্তী প্রজন্মের লেখিকাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট ‘কৃষ্ণা সিরিজ’-এর গোয়েন্দা কৃষ্ণা এবং পরবর্তীকালে ‘কুমারিকা সিরিজ’-এর অগ্নিশিখা রায় উভয় চরিত্রই প্রচলিত সামাজিক ছক ভাঙা নারীর প্রতিচ্ছবি। প্রভাবতী দেবী নিজে ব্যক্তিগত জীবনে প্রচলিত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেন কিছুটা গতানুগতিকতাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

নলিনী দাশ (১৯১৬-১৯৯৩) যিনি প্রায়শই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাতনি হিসেবে পরিচিত হন, স্বকীয় সাহিত্যিক প্রতিভায় উজ্জ্বল এক নাম। বিশেষত শিশু-কিশোর সাহিত্যে তাঁর অবদান। বিশেষ করে ‘গণ্ডালু সিরিজ’ তাঁকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে। অ্যাডভেঞ্চারধর্মী খুদে গোয়েন্দাদের নিয়ে লেখা এই সিরিজটিতে এনিড ব্লাইটনের ‘ফেমাস ফাইভ’-এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৯৯ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা পর্যন্ত মোট ঊনত্রিশটি ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু’ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল। নলিনী দাশের জীবদ্দশায় এর ষোলটি গল্প ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু’ (১৯৭৫), ‘রঙ্গনগড় রহস্য’ (১৯৭৮), ‘রাণী রূপমতির রহস্য’ (১৯৮৬), ‘হাতিঘিসার হানাবাড়ি’ (১৯৮৮) এবং ‘অলৌকিক বুদ্ধিমূর্তি রহস্য’ (১৯৯০) এই পাঁচটি বইয়ে সংকলিত হয়। আরও দুটি গল্প অন্যত্র গ্রন্থভুক্ত হলেও বাকি এগারোটি অগ্রহস্তিত থেকে যায়। পরবর্তীতে তাঁর পুত্র অমিতানন্দ এই সমস্ত গল্পকে একত্রিত করে ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র’ নামে দুই খণ্ডে (২০০৯, ২০১২) প্রকাশ করেন। ‘গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র’ প্রসঙ্গে ‘নিউ স্ক্রিপ্ট’ থেকে প্রকাশিত দুটি খণ্ডের বিন্যাস একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সংকলনটিতে মোট ঊনত্রিশটি গণ্ডালুর কাহিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে চোদ্দটি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পনেরোটি কাহিনি স্থান পেয়েছে। সম্পাদক বইয়ের শুরুতেই প্রতিটি কাহিনির পত্রিকা প্রকাশের তারিখ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের বিস্তারিত নথি প্রদান করেছেন। তবে এই সংকলনগুলির কালানুক্রমিক তালিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি নির্দিষ্ট অসঙ্গতি নজরে পড়ে। দেখা যায় যে, কাহিনির নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে কালানুক্রমিক নীতি অনুসরণ করে করা হয়নি। অর্থাৎ কিছু কিছু কাহিনি যা প্রকাশের ক্রম অনুসারে দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত

হওয়ার কথা ছিল সেগুলি প্রথম খণ্ডেই স্থান পেয়েছে। ‘গোয়েন্দা গণ্ডলু’ সিরিজে বোর্ডিং স্কুলের চারটি মেয়েকে নিয়ে আবর্তিত হয় কাহিনি - কালু (কাকলি চক্রবর্তী), মালু (মালবিকা মজুমদার), বুলু (বুলবুলি সেন), এবং টুলু (টুলু বোস)। কাহিনিগুলি টুলুর জবানিতে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চারজন অর্থাৎ এক গণ্ডা মেয়ের দলকে সহপাঠীরা আদর করে ‘গণ্ডলু’ নাম দেয়। টুলু আর বুলু অনেক ছোটবেলা থেকেই এই বোর্ডিং-এ রয়েছে, কালুও পরে তাদের সাথে যোগ দেয় এবং সবশেষে আসে মালু। এই চার চরিত্রের মধ্যে বৈপরীত্য ও ভারসাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মালু অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ, সাহিত্যপ্রেমী এবং কবিতা লিখতে ভালোবাসে। অন্যদিকে কালু খুবই বাস্তববাদী, ডানপিটে এবং সাহসী মেয়ে, যে অঙ্ক ও বিজ্ঞানে আগ্রহী। এই দুই বিপরীত মেরুর মেয়ের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যা ‘খোয়াই রহস্য’-তে স্পষ্ট হয়। যেখানে মালুর জলবসন্ত হওয়ার কারণে কালুও পেটে ব্যথার নাটক করে হস্টেলে থেকে যায়। টুলুর মতে তার ও বুলুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশি হওয়ায় মালুর সঙ্গে কালুর বন্ধুত্ব আরও জোরালো হয়। তবে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কালু ও মালুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার মূল কারণ হল লেখিকা এই দুজনকেই কাহিনিতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সবকিছুর নেতৃত্বে থাকে সাহসী কালু, তার সাহসিকতা আর বুদ্ধির জোরেই বেশিরভাগ রহস্যের সমাধান হয়। মালু কল্পনাপ্রবণ হলেও ভীতু নয় এবং অ্যাডভেঞ্চারে তার গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা থাকে। বুলু চরিত্রটি কিছুটা ভীতু প্রকৃতির, বাকি বন্ধুদের সাথে থাকার কারণে সে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের অংশীদার হয়। লেখিকা কালু এবং মালু এই দুটি চরিত্রকে যত্নের সঙ্গে নির্মাণ করলেও টুলু ও বুলু পাঠকের কাছে ততটা গুরুত্ব পায় না। তবে এই চারজনকে বাদ দিলে কেবল গণ্ডালুদের সদস্য সংখ্যাই কমে যায় না বরং কাহিনির সামগ্রিক রচনা কৌশলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে দময়ন্তী দত্তগুপ্তের আবির্ভাব ঘটে, যা ছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। গোয়েন্দা বলতে আমরা সাধারণত যে ছবিটা দেখতে অভ্যস্ত, দময়ন্তী তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সে কোনো পেশাদার গোয়েন্দা নন বরং একজন ইতিহাসের অধ্যাপিকা। দময়ন্তী বন্দুক-পিস্তল নিয়ে অপরাধীর পেছনে ছোটো না। তার প্রধান অস্ত্র হলো বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যা সে তার পেশা থেকে রপ্ত করেছে। একজন ঐতিহাসিক যেমন বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অতীতের কোনো ঘটনাকে পুনর্গঠন করেন, ঠিক সেভাবেই দময়ন্তী অপরাধের নানা সূত্রকে একত্রিত করে তার মূল রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করে। সে নিজে অপরাধীকে তাড়া করে ধরে না বরং যাদের তা ধরার দায়িত্ব তাদের কাছে রহস্যের সমাধান পৌঁছে দেন। এটি দময়ন্তী চরিত্রকে শুধু গোয়েন্দা নয় বরং একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ‘রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী’ গ্রন্থের ভূমিকায় মনোজ সেন (১৯৪০) জানিয়েছেন –

“আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে দময়ন্তী দত্তগুপ্তের গল্প, ‘সরল অঙ্কের ব্যাপার’ নিয়ে আমি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছিলুম। সেটা ছিল গোয়েন্দা গল্প, প্রকাশিত হয়েছিল ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকায়। সম্পাদক স্বর্গত রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও উৎসাহে যতদিন ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ততদিন ধরে আমি দময়ন্তী দত্তগুপ্তের গল্প লিখে গেছি। রঞ্জিতবাবুর চলে যাওয়া আর সেই সঙ্গে ‘রোমাঞ্চ’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর লিখেছি।”^৬

বুকফার্ম প্রকাশনা সংস্থা মনোজ সেনের লেখালেখিগুলো সংকলিত করেছে এবং আশা করা যায় দময়ন্তীর আরও অনেক কাহিনি নতুন করে প্রকাশিত হবে। কিন্তু দময়ন্তীর সব লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছবে কিনা তা আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে মনোজ সেন নিজেই তাঁর রচনার ভূমিকায় এক আবেগঘন মন্তব্য জানান –

“আর একটি কথা। দময়ন্তীর অনেক গল্প আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। সেগুলি ছড়িয়ে আছে পুরোনো ‘রোমাঞ্চ’র বা অন্যান্য পত্রিকার পাতায়। সেগুলোর সন্ধান পেলে বুকফার্মের কাছে পৌঁছে দিলে কৃতজ্ঞ হব।”^৭

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, লেখকের কাছেও তার নিজের সৃষ্টির সমস্ত অংশ সংরক্ষিত নেই। ফলে পাঠকের সামনে দময়ন্তীর সম্পূর্ণ জগৎ তুলে ধরাটা এখন এক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা কেবল প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগেই সম্ভব নয় বরং আগ্রহী পাঠক ও সংগ্রাহকদের সহযোগিতার ওপরও নির্ভরশীল।

বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাবের মূলে ছিল এক বিশেষ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তবে বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের শুরুর দিকে এই ধারণা অনেকটাই বদলে গেছে। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীরা এখন আর শুধু ঘরের কোণে আবদ্ধ নেই বরং নিজেদের পছন্দের পেশা বেছে নিয়ে সেখানে সফলও হয়েছে। এমনই একজন গোয়েন্দা চরিত্র হলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৪৭) সৃষ্টি গার্গী। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল - গার্গীর মতো একজন শক্তিশালী মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের জন্ম কোনো নারী সাহিত্যিকের হাতে হয়নি বরং একজন পুরুষ লেখকের হাতেই হয়েছে। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘ঈর্ষার সবুজ চোখ’ উপন্যাসটি ‘রবিবাসরী’-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর গার্গীকে কেন্দ্র করে লেখা এই কাহিনিটি ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গার্গী চরিত্রটি নির্মাণের নেপথ্য কাহিনিতে লেখক বলেছেন-

“আমার যা পর্যবেক্ষণ তাতে বাঙালি মেয়েরা খুব তীক্ষ্ণবী হন, মানুষের চোখ দেখলে ধরতে পারেন মানুষটি কেমন। তাছাড়া মেয়েরা একটু বেশি কথা বলেন বলে তাঁদের বিশ্লেষণী শক্তিও অসাধারণ।”^৮

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির শ্যামলা বর্ণের এক সাধারণ দেখতে মেয়ে গার্গী। যেখানে বেশিরভাগ লেখক নারী গোয়েন্দাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিবর্তনে খুব বেশি মনোযোগ দেননি, সেখানে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় গার্গীর জীবনকে তার কিশোরীবেলা থেকে শুরু করে একজন মা হওয়ার সম্পূর্ণ ধারাবাহিকতা পর্যন্ত উন্মোচন করেছেন। এই গভীর চিত্রায়ন গার্গীকে কেবল একজন গোয়েন্দা হিসেবে নয় বরং একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা বা সমাজকর্মী হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত গার্গী ‘প্যারাইডাইস প্রোডাক্টস’-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করে এবং সাফল্য অর্জন করে। গার্গীর ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাগত জীবনের এই নিবিড় একাত্মতা তার চরিত্রকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে এক কন্যাসন্তানের জননী হওয়ার পরও গার্গী পারিবারিক চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে পেশাগত জীবন ও শখের গোয়েন্দাগিরিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছে। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক এবং পারিবারিক দায়িত্বগুলো তার পেশাগত অনুসন্ধানের প্রভাব ফেলে এবং তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই মেলবন্ধন গার্গীকে কেবল রহস্য সমাধানের একটি যন্ত্র না রেখে তাকে আরও মানবিক এবং বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। গার্গীকে অন্যান্য নারী গোয়েন্দা চরিত্র থেকে আলাদা করে তাকে এক আধুনিক, স্বাবলম্বী এবং বহুমুখী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যা বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে নারী চরিত্রের উপস্থাপনায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে পুরুষ গোয়েন্দাদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া আধিপত্যের মাঝে সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫৫-২০১৫) এক নতুন ও বিপ্লবী ধারার সূচনা করেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি পাঠক মহলে মিতিন মাসি নামেই পরিচিত। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর রচনায় নাগরিক মধ্যবিত্ত নারীর জীবনকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা তাঁর লেখার এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর চব্বিশটি উপন্যাস ও দু’শোর বেশি ছোটগল্পের মূল সুরই হল মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ। মিতিন-কেন্দ্রিক কাহিনিগুলিও এই ধারার ব্যতিক্রম নয় বরং এই বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আরও প্রকটভাবে প্রতিভািত হয়েছে। ‘পালাবার পথ নেই’ উপন্যাসের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপারমিতার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’-তে ধারাবাহিকভাবে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনি প্রকাশিত হতে থাকে। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ২০১৫ সালে ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’-তে প্রকাশিত হয় তাঁর মিতিন-কেন্দ্রিক শেষ কাহিনি ‘স্যাণ্ডারসাহেবের পুঁথি’। মিতিনকে নিয়ে মোট ষোলটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ‘পাঁচ মিতিন’ বইয়ে পাঁচটি কাহিনি সংকলিত হয়েছে এবং বাকিগুলিতে একটি করে কাহিনি। সব মিলিয়ে মিতিনের মোট কুঁড়িটি কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৩ সালে যখন ‘সারাণ্ডায় শয়তান’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় তখন থেকেই তার নতুন পরিচয় গড়ে ওঠে। এই উপন্যাসে তিনি মিতিন মাসি নামে পরিচিত হন এবং এই নামেই তিনি পাঠক মহলে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই নাম পরিবর্তনটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এটি চরিত্রটির সাথে পাঠকের এক আত্মীয়সুলভ সংযোগ স্থাপন করে। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি ওরফে মিতিন মাসি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পুরোপুরি পেশাদার মহিলা গোয়েন্দা। অধিকাংশ সমালোচকের মতে, বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা শাখার আবির্ভাবের প্রায় পাঁচ দশক পরে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর হাত ধরে মহিলা গোয়েন্দা কৃষ্ণা

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে পা রাখেন। নিজের বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা থেকেই কৃষ্ণ মূলত অপরাধীদের পিছু ধাওয়া করে। এই ব্যক্তিগত প্রতিশোধের স্পৃহা থেকেই সে অপরাধের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে জিততে থাকে। তবে তাকে কোনোভাবেই পেশাদার গোয়েন্দা বলা যায় না, কারণ তার গোয়েন্দাগিরির মূল উদ্দেশ্য জীবিকা অর্জন ছিল না। কিন্তু মিতিনকে আমরা খুব সহজে বলতে দেখি -

“পেটের ধান্দায় লোকে চাকরি করে, আমি করি গোয়েন্দাগিরি।”^৯

এই উক্তিটি মিতিনের পেশাদারিত্বের এক সুস্পষ্ট ঘোষণা। শুরু থেকেই সে একজন বিবাহিত নারী। সংসার সামলানোর পাশাপাশি সে ‘থার্ড আই’ নামে একটি গোয়েন্দা সংস্থার মালিক। ‘সারাণ্ডায় শয়তান’-এ সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিন সম্পর্কে জানিয়েছেন -

“মাত্র বত্রিশ বছর বয়স, কিন্তু এর মধ্যেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মিতিনের খুব নামডাক। মিতিন ওরফে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জির গোয়েন্দা সংস্থা থার্ড আইকে লালবাজারের তাবড় তাবড় পুলিশ অফিসাররা রীতিমতো সমীহ করে। বেশ কয়েকটা জব্বর কেস সলভ করেছে মিতিন।”^{১০}

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে অন্য কোন মেয়ে গোয়েন্দার ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি দেখা যায় না। তারা সবাই আর্থিক দিক থেকে কমবেশি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবেশে বাস করা মানুষ। কিন্তু লেখিকা মিতিনকে একেবারে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তাই তার স্বপ্নগুলো অতিসাধারণ মানুষদের ধরাছোঁয়ার বাইরে যায় নি। মিতিন মাসির নিজস্ব বাড়ি না থাকলেও তার ঢাকুরিয়ার বাড়িটা সে যথাসম্ভব পরিকল্পনা সহকারে সাজিয়েছে যা তার অফিসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট -

“দু’কামরার ভাড়া বাড়ির পিছনের চওড়া বারান্দায়। নিজেই বারান্দাটা ঘিরে নিয়েছে মিতিন। অফিস কাম ডিটেকশন চেম্বার। খুপরি জায়গাটুকুতে আছে চেয়ার-টেবিল, ক্ষুদ্রে সোফা, একখানা ফাইল-কেবিনেট, বেঁটে একটা স্টিল আলমারি আর বই-টাই। গোপন নথিপত্র থাকে আলমারিতে। নিজের পেশার প্রয়োজনীয় জিনিসও।”^{১১}

এই ছোট্টো চেম্বারটিই হল মিতিনের গোয়েন্দা এজেন্সি ‘থার্ড আই’-এর অফিস ঘর। মিতিনের চেম্বারের বর্ণনা থেকে তার পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের এক চমৎকার ভারসাম্য ফুটে ওঠে। স্বল্প পরিসরের ভাড়া বাড়িতে একদিকে তার গোয়েন্দা অফিস, যেখানে সে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে অন্যদিকে সেখানেই স্বামী-সন্তান নিয়ে তার পরিপাটি সংসার। কিন্তু এই সংসার জীবন তার পেশাগত কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি বরং সে দক্ষতার সঙ্গে দুই দিক সামলে চলেছে। মিতিন মাসি যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় মহিলা গোয়েন্দা একথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কিশোর পাঠকদের কাছেই নয় প্রায় সব বয়সী পাঠকই মিতিনের কাহিনি পড়েন। লেখিকা পাঠকের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন গোয়েন্দার অন্দরমহলে বা বলা ভালো এক মেয়ে গোয়েন্দার অন্দরমহলে। একজন গোয়েন্দা গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি কীভাবে স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসার করে, আত্মীয়দের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কীভাবে জীবন উপভোগ করে লেখিকা তা পাঠককে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার সুযোগ করে দিলেন। কৃষ্ণ এবং শিখার গোয়েন্দাগিরি যেখানে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা জনসেবার সাথে জড়িত ছিল সেখানে মিতিনের গোয়েন্দাগিরি আধুনিক যুগের পেশাদারিত্বের প্রতীক। সুচিত্রা ভট্টাচার্য মিতিন চরিত্রটির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, একজন নারীও সফলভাবে একটি পেশাদার গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করতে পারে। যা বাংলা সাহিত্যের একজন আধুনিক বাঙালি নারীর বহুমুখী জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক নারী গোয়েন্দা চরিত্র রয়েছে যাদের নিয়ে খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। কেউ শখের বশে গোয়েন্দাগিরি করে আবার কেউ পরিস্থিতির চাপে পড়ে রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন লেখকের এমন কিছু নারী গোয়েন্দা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হল।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮১) সৃষ্ট পুরুষ গোয়েন্দা পারিজাত বক্সীর পাশাপাশি দুটি মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রও নির্মাণ করেছেন। হৈমন্তী ঘোষাল এবং বৈশাখী ব্যানার্জি - এই দুটি চরিত্রকে নিয়ে তিনি রহস্য কাহিনি রচনা করেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট হৈমন্তী ঘোষাল ‘অমানুষিক’ গল্পের একজন শখের গোয়েন্দা। গল্পে লেখক নিরুপমের বয়ানে বলেন -

“এদেশে হৈমন্তীর আগে নারী গোয়েন্দা কেউ ছিল বলে জানি না, পরে আর কেউ হয়েছে কিনা বলতে পারব না।”^{১২}

যদিও গল্পটির প্রকাশকাল জানা যায় নি কিন্তু এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রভাবতী দেবীর কৃষ্ণা কাহিনিরও আগে রচিত। হৈমন্তী ঘোষালের পাশাপাশি হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ‘পাথরের চোখ’ উপন্যাসে বৈশালী ব্যানার্জি নামে আর একজন পেশাদার গোয়েন্দা চরিত্রের নির্মাণ করেন। ২০১৭ সালে প্রকাশিত ‘কর্কটক্রান্তি’ উপন্যাসে একজন ফরেনসিক মেডিসিনের ডাক্তার এবং বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজের অটোপসি সার্জেন্ট দীপশিখা মুখার্জিকে নিয়ে হাজির হলেন ইন্দ্রনীল সান্যাল। ইন্দ্রনীল সান্যালের বেশিরভাগ উপন্যাসে আলাদা আলাদা নারী চরিত্র গোয়েন্দার ভূমিকায় থাকে, যাদের প্রায় সবাই পেশায় ডাক্তার। বত্রিশ বছর বয়সী দীপশিখা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত এবং তার চিকিৎসার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ উপন্যাসে উঠে এসেছে। এটি বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা কারণ এর আগে নারী গোয়েন্দারা সাধারণত নিখুঁত এবং অন্ধকারহীন জীবন নিয়ে হাজির হত। ইন্দ্রনীল সান্যাল তাঁর চরিত্রগুলোকে এই গতানুগতিক ধারার বাইরে এনেছেন যা তাদের আরও বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। নন্দিনী নাগের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রটি হল তিস্তা দত্ত। তার প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির বই ‘হত্যার পরিমিতি’ ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়। ‘হত্যার পরিমিতি’ গ্রন্থে দুটি কাহিনি রয়েছে ‘ভালোবাসার পাসওয়ার্ড’ ও ‘হত্যার পরিমিতি’। ২০২১ সালে প্রকাশিত হয় ‘ডুয়ার্সে ডামাডোল’। তিস্তা একজন প্রকাশনা সংস্থার সহ-সম্পাদক যার স্বামী অর্ক একজন ক্রিমিনাল ল’ইয়ার। তিস্তার সহকর্মী ও বন্ধু রাজীবও রহস্য সমাধানে তার সঙ্গী হয়। মিতিনের মতো তিস্তাকেও পেশাদার হিসেবে সম্মানীয় পদে থাকার জন্য কেউ কটাক্ষ করতে পারেনি। তবে শখের গোয়েন্দা হওয়ায় তাকে কিছুটা বিদ্রূপের শিকার হতে হয়েছে। তিস্তা গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করলেও তার মধ্যে মিতিনের মতো অদম্য জেদ দেখা যায় না। সে সহজেই বলতে পারে –

“তেমন বুঝলে হাত তুলে দিয়ে ফিরে আসব। আমাকে তো আর কেউ মাথায় বন্দুক ধরে খুনের কিনারা করতে বলছে না! আর আমার প্রফেশনও নয় যে কেস না সলভ করে ফিরে এলে মানসম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে, সুতরাং ভয় পেও না।”^{১৩}

এই দিক থেকে তিস্তা অন্যান্য নারী গোয়েন্দাদের থেকে ভিন্ন। পারমিতা ঘোষ মজুমদার (১৯৬৬) যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন কর্মকর্তা। ২০১৩ সালে ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’-এ তার উপন্যাস ‘রাবংলা সম্ভব’-এর মাধ্যমে গোয়েন্দা রঞ্জাবতীকে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রঞ্জাবতী পড়াশোনা শেষে কিছুদিন সংবাদপত্রে চাকরি করার পর ‘ট্রুথ সিকার্স’ নামে নিজের একটি গোয়েন্দা সংস্থা খোলে। তার সঙ্গী হিসেবে ছিল লাজবন্তী, যে ব্যোমকেশের অজিতের মতো তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলো লিখে রাখত। ২০১৭ সালে ‘আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী’-তে পারমিতা ঘোষ মজুমদারের আরেকটি লেখা প্রকাশিত হলেও সেখানে রঞ্জাবতীর কোনো কাহিনি ছিল না। তার পরিবর্তে লেখিকা স্কুল পড়ুয়া পোগো ও তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে লিখেছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, রঞ্জাবতীকে নিয়ে সম্ভবত আর কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৪ সালে বরানগরে জন্মগ্রহণকারী শাস্ত্রী সেনগুপ্ত রবীন্দ্রভারতী থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর লেখা উপন্যাস ‘নেপাল রহস্য’-তে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষ করে বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্র মৈত্রী রায় যিনি ‘চর্যাচর্যবিশিষ্ট’ নিয়ে গবেষণা করছেন। তার অনুসন্ধানের সূত্র ধরে গল্পের প্লট গড়ে উঠেছে। কাহিনিটি উত্তমপুরুষে লেখা হলেও মৈত্রীর নাম বারবার এসেছে। মৈত্রী নেপালে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও সেই পুঁথির দ্বিতীয় খণ্ড খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। তবে মজার বিষয় হল সে পুঁথিটি নেপালে নয় বরং কলকাতায় ফিরে তার গাইডের বাড়িতেই খুঁজে পায়। উপন্যাসটি ঠিক গোয়েন্দা কাহিনি না হলেও এর অনুসন্ধানী চরিত্র এবং অ্যাডভেঞ্চারের ভাব পাঠকের মনে গোয়েন্দাগিরির স্বাদ এনে দেয়।

বলা যায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দাদের অবদান কেবল অপরাধ সমাধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমাজের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বনির্ভরতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। লেখকরা নারী গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করলেও তারা শুধু একটি পুরুষ নামের পরিবর্তে নারীর নাম বসিয়ে দেননি। তারা

তাদের নারীসত্তা নিয়েই কাহিনিতে হাজির হন। গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি তাদের ঘর গোছানো, রান্না করা বা সন্তানের খোঁজ নেওয়ার মতো সাংসারিক দায়িত্বও পালন করতে দেখা যায়। বর্তমানে নারী গোয়েন্দা সাহিত্য ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এটি শুধুমাত্র বইয়ের জগতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনেও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘শুভ মহরত’ বা ‘তাহার নামটি রঞ্জনা’-র মতো চলচ্চিত্র এবং ‘চেক মেট’ বা ‘গোয়েন্দা গিন্নি’-র মতো ধারাবাহিকগুলো দর্শকদের মধ্যে নারী গোয়েন্দাদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছে। মনোজ সেনের দময়ন্তী সিরিজও এখন ওয়েব সিরিজে রূপান্তরিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় দর্শকরা নারী গোয়েন্দাদের নিয়ে কৌতূহলী এবং তাদের প্রতি আগ্রহশীল। সামাজিক পরিবর্তনের কারণে নারী গোয়েন্দারা এখন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। প্রভাবতী দেবীর সময়ে একজন মেয়ের গোয়েন্দাগিরি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এখন আর ততটা কাল্পনিক নয়। পাঠকরা এখন আর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে না বরং সমালোচনামূলক ভাবে তার মান যাচাই করে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে নারী গোয়েন্দাদের কাহিনি অন্যান্য গোয়েন্দা সাহিত্যের সমপর্যায়ে বিবেচিত হবে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ‘আমার গোয়েন্দা কাহিনি লেখার পশ্চাদপট’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ২৬০
২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, ‘গোয়েন্দা গল্পের অল্পবিস্তর’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ২৪
৩. ঘোষ, নির্মাল্য কুমার, ‘গোয়েন্দানীর সাতকাহন’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৪. সিংহ, বিবেক, ‘বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : উনিশ ও বিশ শতক’, সম্পাদক: ড. সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ১০৪
৫. ঘোষ, নির্মাল্য কুমার, ‘গোয়েন্দানীর সাতকাহন’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৬৯
৬. সেন, মনোজ, ‘ভূমিকা’, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র ১, বুকফার্ম, কলকাতা, ২০১৯
৭. তদেব
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ‘আমার গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার পশ্চাদপট’, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক শারদ সংখ্যা ১৪২০, কলকাতা, পৃ. ৫
৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ পাবলিশাস্, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ২৪
১০. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, সারাণ্ডায় শয়তান, আনন্দ পাবলিশাস্, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩৫
১১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, জোনাথনের বাড়ির ভূত, আনন্দ পাবলিশাস্, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ. ১০৭
১২. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, ‘অমানুষিক’, কিশোর সাহিত্য সমগ্র ২, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০৭
১৩. নাগ, নন্দিনী, ডুয়ার্সে ডামাডোল, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৩৩